BL College Journal

Volume -1, Issue-1, 2019
pp 23-35

বঙ্গ, বাংলা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় নায়ক

ড. ইমানুল হক

সাবেক সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, ভারত
ই-মেইল : emanh66@gmail.com

ক। সকল ইতিহাস আসলে চিন্তার ইতিহাস।

খ। ইতিহাস আসলে ব্যাখ্যান।

ই এইচ কার।। কাকে বলে ইতিহাস

***

'বঙ্গ' শব্দের অর্থ কী? 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ, (কার্পাস তুলো।[১] সংস্কৃত 'আল' শব্দের মানে, সমৃদ্ধ। 'বঙ্গাল' শব্দের অর্থ, কার্পাস তুলো সমৃদ্ধ অঞ্চল।[২] 'বঙ্গ' অস্ট্রিক ভাষা থেকে গৃহীত। মূলে আছে 'বোংগা' শব্দটি বলে অনুমান। আর তামিল ভাষায় 'বঙ্গ' মানে সুতিবস্ত্র। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা 'বঙ্গ' বলতে বোঝেন, তাঁত। 'তামিল' শব্দটির সংস্কৃত রূপ 'দ্রাবিড়'। আর এস মুগালি 'কন্নড় সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখছেন, 'দ্রাবিড় কথাটি তামিল কথাটিরই সংস্কৃত রূপ।'[৩]

আর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন :

১. রঙ্গ, রাং, টিন ২. কার্পাস ৩. বেগুন গাছ ৪. বঙ্গদেশ [মহাভারতের মতে, 'বলিরাজের পুত্র বঙ্গের অধিকারে স্থিত দেশ 'বঙ্গ'। (মহা ১,১০৪,৫১-৫৩)। মতান্তরে, তিব্বতিয় bans (অর্থাৎ 'জলময়, স্যাঁতসেঁতে) হইতে 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'বঙ্গ' পুরাকালে নদীবহুল ও জলপ্রায় দেশ ছিল। 'রঘুবংশে'র বর্ণনায় (৪, ৩৬) রঘু যে বঙ্গরাজগণকে উৎখাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নৌবলই যুদ্ধের প্রধান সহায়।[৪] (পৃষ্ঠা-১৪৪২)

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' -এ লিখছেন, 'বঙ্গরাজ্য' সমুদ্রতীরস্থ।[৫] নীহারঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' এ লিখছেন 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ।'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।'[৬] এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত–এও 'বঙ্গ'-র উল্লেখ আছে।[৭] আর 'বাংলা' বা 'বঙ্গালাহ্' শব্দটির প্রথম ব্যবহার ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।[৮]

১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নেপালের স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরের এক লিপিতে সুলতানকে 'বঙ্গাল অধিপতি' বলা হয়েছে–

"সুরত্রান সমসদীনো বঙ্গাল বহুলৈ বলৈ

সহাগত্য চ নেপালে ভগ্নো দগ্ধশ্চ সর্বস্বঃ।[৯]

অবিভক্ত বাংলাতেই প্রথম ধান পাওয়া যায়। খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ৩৫০০'তে। বর্তমান বিহারের সারণ জেলার চিরন্দতে। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'এক্সক্যাভেশন্স ইন পান্ডুরাজাস ঢিবি' গ্রন্থে তার সাক্ষ্য মেলে।[১০] প্রসঙ্গত, শুধু মধ্যযুগে নয়, ব্রিটিশ আমলেও বিহার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বাংলার অংশ। আসাম ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায়।

বাঙালি চিরকালই ভেতো, কিন্তু কোনোকালে ভীতু ছিল না। বাঙালি বীর ও বণিক জাতি। শুধু কৃষি নয়, কুটির ও গ্রামীণ স্বর্ণ, বস্ত্র শিল্পে এক দক্ষ যাত্রায় জাতি। পৃথিবীতে তুলোর পোশাকের অগ্রদূত প্রাচীন বঙ্গবাসী। সমুদ্রযাত্রায় অসামান্য পারদর্শী। নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাসে বলা হয়েছে।[১১] রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, চাণক্য এবং ওভিদের রচনায়, গ্রিক ঐতিহাসিক প্লিনি, মেগাস্থিনিসদের বিবরণে তার সাক্ষ্য। বৌদ্ধ পুরাণ 'মহাবংশ'-এ আছে বাংলার সিংহগড় (অধুনা সিঙ্গুর)-এর সন্তান বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনি।[১২] শুশুনিয়া লিপিতে মেলে ইতিহাস। বঙ্গ সন্তান মহাপদ্মনন্দ'র ত্রিয় নিধন ও শৌর্যর সাক্ষ্যবাহী ইতিহাস। আর্য বিরোধিতার কারণে তার কুখ্যাতি। কিন্তু বীরত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। ব্রাহ্মণ্যরাজের বদলে শূদ্ররাজত্ব। মহাপদ্মনন্দ তার পত্তন করেন।[১৩] আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলেও গঙ্গারিডি তথা বাংলা আক্রমণ করতে সাহস করেননি রাজা আগ্রাম্মেস তথা উগ্রসেন বা অগ্রসেনের প্রতাপে।[১৪]

হিন্দু বা বৌদ্ধ পুরাণ, মহাকাব্য বা নাট্যসাহিত্যে আছে 'বঙ্গ'-র কথা। মহাভারতের কথা অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের রাজা বলি'র পাঁচ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, সমতট, পৌন্ড্র।[১৫] বলী রাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে পাঁচ পুত্রের জন্ম।
'মহাভারতে' আছে :
অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাঃ দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম্না কথিতা ভুবি।।
তাঁদের নামে পাঁচ রাজ্যের নাম।[১৬]
যা আসলে 'বঙ্গ'র পাঁচটি এলাকা। আর রামায়ণের দশরথের প্রিয় বন্ধু ছিলেন অঙ্গরাজ্যের রাজা।
'অঙ্গরাজ্যেন সখ্যঞ্চ তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি'।[১৭]

মহাভারতে পৌণ্ড্রক রাজ বীর বাসুদেবের কথা আছে। যাঁরা ছিলেন দুর্যোধনের সহযোগী।[১৮] এবং 'মহাভারত' অনুযায়ী "ভারত যুদ্ধের সময় পৌ-বর্ধনে পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কৌশিকীগুচ্ছে মহৌজা, বঙ্গে সমুদ্রসেন রাজত্ব করিতেছিলেন।[১৯]

আর দীনেশচন্দ্র সেন জানাচ্ছেন :
ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধী লিপি শিখিতেছেন।[২০] কে পি জয়সওয়াল ভারতীয় অতিকথন ভেঙে জানিয়েছিলেন, প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে কিছু প্রজাতন্ত্র বর্তমান ছিল।[২১] বাংলায় ছিল প্রজাতন্ত্র। সে প্রজাতন্ত্র নির্মাণ করে বাংলায় বসবাসকারী

অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ। পৃথিবীর প্রথম পঞ্চায়েত তৈরি করেন এরাই।[২২]

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রায় বাংলায় প্রচলিত কৌমতন্ত্রের (প্রজাতন্ত্র) উল্লেখ করেছেন।

অস্ট্রিকদের এদেশে আসা নিয়ে 'বলা হয়ে থাকে যে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মানুষ ভারতবর্ষে এসেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল দিয়ে। এদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ারও যোগ আছে। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদরা বলেন যে, অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী চল্লিশ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় আসে। সুতরাং এটাই হয়তো অধিকতর সঙ্গত যে তারা আফ্রিকা থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিল।[২৩] এদের একটা অংশ-ই বাস শুরু করে 'বৃহৎ বঙ্গ' এলাকায়। আর এদের ভাষা অস্ট্রিক।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর উৎপত্তি সর্ম্পকে প্রচলিত মত, 'মালয় উপদ্বীপের অধিবাসী এবং দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের আদিবাসীর সঙ্গে মিশ্রণে দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল।[২৪] এরাই পূর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং কাবেরী অববাহিকায় ধান উৎপাদন করেছিল।[২৫] অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠী বাস করত বাংলায়। 'দ্রাবিড়' সংস্কৃত শব্দ। মূলে আছে 'তামিল' শব্দ। তামিল ভাষায় 'বঙ্গ' মানে 'তাঁত। লক্ষণীয়, সংস্কৃতে 'বঙ্গ' মানে 'কার্পাস তুলো'। আর দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন, 'তামিল' জাতির জন্মের মূলে আছে বাংলার তাম্রলিপ্ত। তিনি লিখছেন :

'মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এই নামের উৎপত্তি সর্ম্পকে একটা মত উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এই তাম্রলিপ্তের আর একটি নাম ছিল 'দামলিপ্ত'। দামল জাতীয় লোকের নিবাসবশত এই নাম হইয়াছে। তাহা হইলে মেদিনীপুর জেলার আদিম লোকেরাই তামিল দেশের প্রতিষ্ঠাতা।'[২৬]

'গুড়' উৎপাদনের কেন্দ্র বলে গৌড় নগর ও দেশের উদ্ভব হয়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (২/২৩)এবং বাৎসায়নের 'কামসূত্র'-এ গৌড়ের উল্লেখ আছে।[২৭] এই অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, সমতট, প্রৌড় এবং 'গৌড়' –এর বাসিন্দা ছিল দ্রাবিড়-অস্ট্রিক ভাষীরা। কোল, ভিল, মুণ্ডা, হোসহ উপজাতি নিয়ে গঠিত বাংলার প্রাচীন সমাজ।

অতুল সুর 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে লিখছেন :
চেহারার সাদৃশ্য থেকেই এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, তফশিলভুক্ত জাতিসমূহ উপজাতিসমূহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কোচ রাজবংশীদের কিছু অংশ মঙ্গোলিয় উপজাতি হতে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু বাকি উপজাতিসমূহ আদি-অস্ত্রাল নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই আদি-অস্ত্রাল উপজাতিসমূহ যে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গঠনেই সাহায্য করেছে তা নয়, তারা উচ্চশ্রেণির বাঙালির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ও সংস্কার রচনাতেও যথেষ্ট উপাদান জুগিয়েছে।[২৮]

সুদূর থেকে যারা এসেছিল, তাদের পরিক্রমায় লড়তে হয়েছে প্রকৃতি, পরিবেশ, বন্য পশুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে। কাটতে হয়েছে জঙ্গল, কাটতে হয়েছে পাহাড়, ফসলের জন্য জমি তৈরি করতে হয়েছে। আর লড়তে হয়েছে অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে। বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে। সাংস্কৃতিকভাবে তাদের প্রতিহত করতে হয়েছে আর্য

সংস্কৃতিকে। আর শারীরিকভাবে পুরাণে বঙ্গের মহিষাসুর লড়েছে দুর্গার বিরুদ্ধে। মহাকাব্যে ভীম আর অর্জুনের বিরুদ্ধে। 'রঘুবংশে' রঘু আদি বাঙালির প্রতিপক্ষ। বঙ্গের সাগরতীরের কপিলমুনির কাছে বাঁধা পড়েছে রামের বংশের প্রথম পুরুষ সগর রাজার ৬০ হাজার অশ্বমেধের ঘোড়া। কে জানে কেন রামের পুর্বপুরুষ, সগর বংশের চতুর্থ পুরুষ রঘুপুত্র প্রবুদ্ধ রাস কল্মাষপাদ হয়ে যান।[২৯]

আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলেও গঙ্গারিডি তথা বাঙালির পুর্বপুরুষদের আক্রমণের সাহস দেখাননি। কারণ খুঁজতে হবে গ্রিক ঐতিহাসিকদের রচনায়। সলিনস বলেছেন, গঙ্গারিডিদের ৬০ হাজার পদাতিক, ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ হস্তী আছে। (McCrindle, JW-Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, Cambridge Ed. London, 1965, pg.160।[৩০] ভার্জিলের 'জিওরজিক্স' (অধ্যায় ৩), কল্হনের 'রাজতরঙ্গিনী', 'আরগন্টিক্স'-এ আছে বাঙালির বীরত্বের পরিচয়। চণ্ডাশোক অশোকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল কলিঙ্গিয়ীরা। প্লিনি মেগাস্তিনিস অনুসরণে জানাচ্ছেন, কলিঙ্গিয়ীদের রাজধানী ছিল পোর্তালিস বা পার্থালিস যা আসলে বর্ধমানের পূর্বস্থলী।[৩০ক]

খ্রিস্ট পরবর্তী যুগে শশাংকের পর পাল রাজত্ব। পাল রাজত্ব পেরিয়ে সেন যুগ। সেন রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সূচনা। সংস্কৃত রাজভাষা হলো। হলো বাংলাভাষার গুরুত্বহানি। ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তার প্রসার ঘটল। জাত পাত, অস্পৃশ্যতা ছিল না বাংলায়। তার সূচনা হল। নারী স্বাধীনতা খর্ব হল।[৩১] দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে এর সাক্ষ্য মেলে। কৌলিন্যপ্রথা চালু করলেন বল্লাল সেন। বহুবিবাহ প্রথার প্রসার হলো। বল্লালী বালাই ইন্দির ঠাকরুনদের দুঃখের বারমাস্যার শুরু। বাঙালি বণিকদের দাপট কমলো। রাজস্থান গুজরাট থেকে সুদখোর ব্যবসায়ীদের আগমন হল বল্লাল সেনের আগ্রহাতিশয্যে।[৩২] সতীন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : ব্যাপারটা ঘটল ঠিক ইংল্যান্ডে যা ঘটেছিল তার বিপরীত। দেশেও স্বর্ণকাররাই দেশি লোকের ঋণের চাহিদা মেটাত, এমনকি রাজারও। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিদেশি ইহুদিরা। দেশের স্বার্থে আর্থনীতিক কাঠামো রক্ষা করতে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ড ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দেশ থেকে ইহুদি বিতাড়ন করলেন। ইংল্যান্ড বেঁচে গেল। আর বাঙলার রাজা বল্লাল সেন এর পূর্ব শতকে দেশি স্বর্ণকারদের সঙ্গে ঝগড়া করে, দেশের আর্থনীতিক কাঠামোতে বসালেন বিদেশি গুজরাটি ও রাজস্থানি কুসীদজীবীদের। ফলে বাংলার আর্থনীতিক ব্যবস্থা হল ঘায়েল এবং পরবর্তীকালে রাজস্থানি জগৎ শেঠ এসে বাঙলার অর্থনীতি তো বটেই রাজনীতি-তরণীরও হাল ধরে বসলেন। বাঙালি সমাজ এতে ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল।[৩৩] সমুদ্র বাণিজ্যে পারদর্শী বাঙালি বণিকদের সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হলো। বড় বড় সরকারি পদে বসানো হতে লাগল বহিরাগতদের। অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, পাল ইত্যাদি বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীরা রাজ আনুকূল্য লাভের জন্য কায়স্থ হলেন, সরকারি পদ পেলেন। বাঙালি জয়দেবরা সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যাপৃত হলেন। জাতিভেদ প্রথা চালু হল। সামাজিক অনাচার ও ব্যভিচার বাড়ল।

সতীন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন: বাঙালি কখনো একান্তভাবে জমিনির্ভর ছিল না; দেশের ধনভাণ্ডার পূর্ণ হতো কম বেশি আংশিক শিল্পজাত মাল সরবরাহ করে।[৩৪] আর সেই ধনভাণ্ডারের অনেকটাই পূর্ণ হতো বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে সমুদ্রে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা

পাওয়ার জন্য দরকার হতো বীর যোদ্ধার। বাংলার লোকগল্পে যার অজস্র সাক্ষ্য।

১২০২ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় তথাকথিত 'অন্ধকারযুগ'। এই 'অন্ধকার' শব্দটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। অন্ধকার বা কালো মানেই খারাপ হবে কেন? এটা বলার পিছনে আর্যমন্যতা বা শ্বেতাঙ্গ চিন্তা কাজ করছে। সভ্যতার সূতিকাগার কালো মানুষের দেশ আফ্রিকা। অন্ধকার মাতৃগর্ভ ছাড়া সন্তানের জন্ম হবে কি? বীজ মহীরূহ হবে কি? চুল সাদা হলে কি বাঙালি মন খুশি হয়? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবি' উপন্যাসে লিখেছিলেন, নিতাইয়ের বয়ানেঃ কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে? একটু অন্যভাবে কি ভাবা যায় না? ১২০০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ আসলে বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগার। 'বাংলা' নাম প্রথম ব্যবহার হচ্ছে, প্রশাসনিক কাজে। ইলিয়াস শাহী রাজবংশের (১৩৪২-১৪৮৭ খ্রি) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ লিখছেন, 'শাহ-ই-বঙ্গালাহ'। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করল বাংলা। এই সময় পর্বে ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার ঘটনা ঘটে। তথাকথিত 'অন্ধকারযুগ' আসলে বাংলা ভাষার সূতিকাগার। এই সময়কাল সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মন্তব্য :

এই সময়ে 'বাঙ্গালা দেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ছিল না। সেই জন্য সাহিত্য চর্চা নামে মাত্র ছিল। বস্তুত, মুসলমান অধিকার কাল হইতে এই সময় পর্যন্ত কোনো বাঙ্গালা সাহিত্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমরা এই ১২০১ থেকে ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্ধকার বা সন্ধিযুগ বলিতে পারি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াস শাহি বাদশাহেরা বুঝিতে পারেন যে, আবশ্যক হইলে দিল্লির রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দেশের সুশাসন রক্ষার জন্য দেশের অগণিত হিদু প্রজাকে জানা ও তাহাদের সহানুভূতি লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনী তাঁহার 'তারিখ-ই-ফিরোয শাহি'তে ইলিয়াস শাহের সহিত হিন্দু রাও, রানা ও জমিদারগণের মৈত্রীর কথা বলিয়াছেন। অবশ্য ইহাদেরই সাহায্যে তিনি ও তাঁহার পুত্র সিকন্দর দিল্লির সম্রাট বাহিনীকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আরো জানাচ্ছেন :

'এইজন্য তাঁহারা দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন। বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস তাঁহাদের সময়েই প্রাদুর্ভূত হন। হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানগণও বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন। এইজন্য ভাব পৃথক হইলেও ভাষায় তাঁহারা হিন্দু অনুসারী ছিলেন।'[৩৬]

চতুর্দশ শতকে বাংলা, বাঙালি এবং বাংলাভাষার বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিস্থাপন এবং তার জয় ঘোষণার পশ্চাতে আছে সামগ্রিকভাবে সুলতানি শাসকদের অবদান। যে অবদানের প্রকৃত সূচনা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-৫৮ খ্রি) হাতে। যিনি প্রথম রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করেন বাংলার নাম। বাংলা ভাষা চর্চাকে গুরুত্ব দেন। জোর দেন হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ে। তিনিই প্রথম 'হিন্দু' পাইকদের সরকারি সেনাদলে চাকরি দেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-ই সর্বপ্রথম সহদেব নামে একজন 'হিন্দু'কে তাঁর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সহদেব ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। আর জগদানন্দ ভাদুড়ীকে নিয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী পদে।[৩৭]

জগদীশ নারায়ণ সরকার লিখছেন, বাংলার প্রথম রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সোনারগাঁওয়ের ইখতিয়ারুদ্দিন হাজী শাহকে ক্ষমতাচ্যুত এবং সোনারগাঁওকে তাঁর রাজত্বের সঙ্গে ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সংযুক্ত করে।[৩৮] সমগ্র বঙ্গদেশের অধিপতি হন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। বাংলাকে তাঁর আমলেই ছয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়-- লাখনৌতি, রাঢ়, বঙ্গ (বাংলা), সাতগাঁ, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম। তাঁর আগে আর কোনো সুলতান এই ছয়টি এলাকার শাসক হতে পারেননি। হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-ই প্রথম নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। ১২০৪ থেকে ১৩৪২ পর্যন্ত বাংলার শাসকেরা দিল্লির অধীন ছিল। কর পাঠাতে হতো প্রচুর। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও স্বাধীনতা ঘোষণার সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি সামরিক শক্তির অভাবে। যদিও ১২০৪ থেকে ১২৫৭ পর্যন্ত ১৪ জন শাসকের মধ্য সাতজন নিজেদের প্রায় স্বাধীন বলে গণ্য করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ শিরান খিলজি (১২০৬-১২০৭), আলি মর্দান (১২০৯-১২১২ খ্রি), গিয়াসুদ্দিন আইয়াজ খিলজি (১২১২-১২২৭ খ্রি), আলাউদ্দিন দৌলত শাহ ওরফে বলকা খিলজি (১২২৯-৩১ খ্রি), মালিক আইবাক আউর খান (১২৩৪ খ্রি, কিছু মাস), মালিক তুঘান তুঘ্রিল খান (১২৩৪-১২৪৫ খ্রি), মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন উজবাক বিন তুঘ্রিল খান (১২৫০-৫৭ খ্রি)।

এ সময় অনেক শাসক স্বনামে অথবা দিল্লির সুলতানের সঙ্গে একত্রে নাম সংযোজন করে মুদ্রা প্রচলন করেন। নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম স্বনামে মুদ্রায় তাঁর সঙ্গে রাখেন দিল্লির সুলতানের নাম, ইখতিয়ারুদ্দিন স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর নিজ নামাংকিত মুদ্রায় রাখেন দিল্লির সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের নাম। ফখর-উদ-দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম বিজয় করেন। লাখনৌতির অন্য শাসকরা স্বল্পকালের স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিন্তু শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজেকে প্রায় স্বাধীন শুধু করলেন না, প্রায় দুশো বছর সে স্বাধীনতা বজায় থাকল। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ আমৃত্যু ভোগ করেন স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার পতাকা পরবর্তী দুশো বছর বয়েছেন বাংলার শাসকরা।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলককে কৌশলগতভাবে যুদ্ধে ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত করেন। দক্ষিণ বিহার, উত্তর বিহার (ত্রিহূত নামে পরিচিত ছিল), চম্পারণ, গোরখপুর, কাশী, বারাণসী পর্যন্ত পৌঁছে যান। বাহারাইচ গিয়ে শেখ মাসুম গাজির দরগায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনিই প্রথম সুলতান যিনি সমগ্র বাংলার অধিপতি হন। এর আগে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নেপালে অভিযান চালান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। প্রভূত ধনসম্পদে বলীয়ান হয়ে উড়িষ্যার জাজনগর আক্রমণ করে সম্পদশালী হন। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও, লখনৌতি দখল করে নিজেকে ঘোষণা করেন 'শাহ-ই-বঙ্গালিয়ান', 'সুলতান-ই-বঙ্গালিয়ান', বাঙালিদের সুলতান। আবদুল করিমের মতে, 'বাঙালিদের সুলতান' উক্তির মধ্যে আমাদের জাতীয়তাবাদের বীজ নিহিত। দিল্লির ঐতিহাসিক শামস সিরাজ আফিফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা; শাহ-ই-বাঙালিয়ান', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

একথা সত্য যে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভুসুকু 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলি' উচ্চারণ করেছেন,

গিয়াসুদ্দিন বলবনের সময় থেকে 'বাঙ্গালাহ' নাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রিক ও শাসনকার্যের ব্যবহারে প্রথম ভূমিকা নেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। আগে বাংলার সুলতানদের সৈন্যদল ছিল মূলত তুর্কি হাবসি বা বিদেশি সৈন্যপরিবৃত। সেখানে প্রধান পরিবর্তন আনলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। নিয়োগ করলেন বাঙালি বাংলাভাষী বাগদি, বাউরি, ডোম, হাড়ি ইত্যাদি শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের। এরা এদেশের জল হাওয়া রাস্তাঘাট নদীনালা আবহাওয়া চিনতেন জানতেন বুঝতেন। যা বিদেশাগত সৈন্যদের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন। ফিরোজ শাহ তুঘলককে পরাজিত করার পিছনে এই সৈন্যদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এরা মুখে শিস দিত। রাইবেঁশে নামক নৃত্যকলার মাধ্যমে আনন্দে শরীর চর্চা করত। (এই রাইবেঁশে নাচ এখনো আছে। ২০১৪'র কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বইমেলায় প্রদর্শিত হয়েছে)।

এই সৈন্যরা বাংলায় কথা বলতেন। বিদেশাগতদের ভাষা ছিল ফার্সি। পরস্পরের সংস্পর্শে ভাষায় বদল এল। বাংলায় ঢুকল বহু আরবি ফার্সি তুর্কি শব্দ। তেমনি বিদেশিরাও শিখলেন বাংলাভাষা। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলাকে শাসনকার্যে গুরুত্ব দিলেন। আর তাঁর পদস্থ কর্মচারীদের নামের শেষে যুক্ত করলেন 'বাঙ্গালাহ' পদবী। তাঁর প্রধান অমাত্যবর্গ ও সৈন্যদের পদবিগুলো খেয়াল করুন 'বায়ান-ই-বাঙ্গালাহ', 'লস্কর-ই-বাঙ্গালাহ', ও 'পাইক-ই-বাঙ্গালহ'। একজন জাতীয় শাসক হিসেবে জাতীয় পরিচিতি ভাষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া শামসুদ্দিন ইলিয়াস তাই বাংলার প্রথম জাতীয় নায়ক। নায়ক তবে ইতিহাসে উপেক্ষিত। বিশেষত ভারতীয় বাঙালিরা তাঁর কথা জানে বললে অন্যায় হবে। তাঁর নাম অপরিচিত করে রাখা হয়েছে আমজনতার মনে। তাঁকে স্মরণ না করা এবং যোগ্য সম্মান না দেওয়া জাতীয় অপরাধের শামিল।

বাঙালি সেভাবে তাঁকে সম্মান না জানালেও দিল্লিওয়ালারা তাঁকে ঠিক চিনেছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়কার ঐতিহাসিক এবং 'তারিখ-ই- ফিরুজ শাহি'র লেখক তাঁকে 'মুসলমান' বলে মানতেই চাননি। তিনি লিখেছেন 'ইলিয়াস বাঙালি'।

বারানি 'তারিখ ই ফিরুজ শাহী'তে লিখছেন, বাঙালি পাইকা সৈন্য, যাহারা বহু বৎসর যাবৎ নিজদিগকে বাংলার শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া ভাবিত এবং 'ইলিয়াস বাঙালি'র (মোটা হরফ প্রাবন্ধিকের) সামনে আস্ফালন করিয়া বেড়াইত...."।

বারানি ফিরোজ শাহ তুঘলকের নুন খাওয়ায় বাঙালি সৈন্যকে পরাজিত এবং দিল্লিবাহিনীকে জয়ী দেখিয়েছেন। যদিও তা ইতিহাসসম্মত নয়। আরেকটা বিষয়ও আজকের দিনের গর্বিত বাঙালির কাছে শিক্ষণীয়। বাঙালি সৈন্যের সঙ্গে মুসলিম সৈন্যের লড়াই কথাটার ব্যবহার বারানির গ্রন্থে। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে মুসলিম বলে মানতেই চাননি বারানি। তিনি তাঁর চোখে 'ইলিয়াস বাঙালি'। অতুল সুরের মতে, বাঙালির ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। কিন্তু বাঙালির ইতিহাস না লিখে রাখার সাধারণ প্রবণতা থেকে বেশিরভাগ বাঙালি শাসক বা বীরের কথা আমরা জানি না। যাঁদের কথা জানা সেই শশাংক, বৌদ্ধ পালরাজারা, বা ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের পরিচয় 'গৌড়েশ্বর' হিসেবে। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজে লক্ষ্মণাবতী তথা লাখনৌতি বা উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করলেও সমগ্র বাংলায় ছিল তাঁর বিস্তৃতি।

শত্রুদের নিন্দাও অনেক সময় প্রশংসার শামিল। দিল্লির ইতিহাসকারেরা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের এই স্বাধীনতা প্রচেষ্টা, সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ভাষাগত সমন্বয় ও বিকাশের চেষ্টা ভাল চোখে দেখেননি। বারানির দৃষ্টিভঙ্গির কথা আগে বলা হয়েছে। দেখা যাক আবুল ফজলের মন্তব্য –'তাঁকে ভাঙ্গারা বলেও উল্লেখ করা হতো'। 'আকবর নামা'র তৃতীয় খ- 'আইন-ই-আকবরি' (রচনাকাল ১৫৯৬-৯৭ খ্রি)। তাতে আছে আবুল ফজলের এই মন্তব্য। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' (রচনাকাল ১৭৮৮ খ্রি) গ্রন্থে গোলাম হোসেন সুলতান ইলিয়াস শাহকে উল্লেখ করছেন 'ভাঙ্গারা' নামেই। মোহাম্মদ কাশিম ফিরিস্তার 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা'র 'ভাঙ্গরা' তথ্য ব্যাখ্যায় জানিয়েছিলেন, তিনি 'ভাঙ্গারা' বা 'বঙ্গরায়' উপাধি নিয়েই সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই 'বঙ্গরায়' উপাধির অর্থ 'বঙ্গের রাজা'। বাঙালি 'হিন্দু' পাইকরা যাঁরা ইলিয়াস শাহের জন্য যুদ্ধ করেছিল তাঁরা নিজেদের বলতেন 'আবু বঙ্গাল' মানে 'বঙ্গালের অধিবাসী'। আর ইলিয়াস শাহকে বলতেন, 'বঙ্গরায় বা বঙ্গরাজা'।

বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশে সুলতানি শাসকদের এক বিরাট অবদান। 'হিন্দু' শাসনকার্যের ভাষা সংস্কৃত। ধর্মের ভাষাও তাই। এমনকী বৌদ্ধ পালরাজারাও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে সংস্কৃতের। দীনেশচন্দ্র সেনের সখেদ মন্তব্য 'হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজদরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগ-ই পেত না'।[৩৯]

দীনেশচন্দ্র সেনের সাহসী মত, 'মুসলিম শাসক ও আমির ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদারগণ বাঙালি কবিদের প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন।[৪০] এই পৃষ্ঠপোষণার মূলে যে প্রেরণা তার আদি নাম শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। 'বাঙ্গালাহ' এবং 'বাঙ্গালাহ'র মানুষকে গর্বিত করেন তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে 'বাঙ্গালাহ'র বহুল ব্যবহারে। তিনিই বাংলার প্রথম নায়ক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম স্থপতি।

নিজেকে 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' হিসেবে ঘোষণা করা বীর শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের প্রভাবেই পরবর্তীকালে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সব বঙ্গের অধিবাসীদেরই 'বাঙালি' বলে ডাকা শুরু হয়। কিছু উদাহরণ দিয়েছেন এম এ রহিম। হজরত আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানি উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়ার অধিবাসী শেখ নূর কুতবুল আলম কে 'শেখ নূরু বাঙালি' বলে উল্লেখ করেছেন। কবি হাফিজ ইলিয়াস শাহি বংশের আরেক শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজমকে 'বাঙ্গালার সুলতান' বলে উল্লেখ করেছেন। বাবরের আত্মজীবনী 'বাবরনামা'য় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও নসরত শাহকে 'বাঙ্গালার সুলতান' ও অধিবাসীদের 'বাঙালি' রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জালালুদ্দিন শাহ মোহাম্মদ শাহ (রাজত্বকাল ১৪১৮-১৪৩৩ খ্রি) কবি কৃত্তিবাস (জন্ম ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ)কে 'রামায়ণ' অনুবাদে (১৪২২-২৪ খ্রি) অর্থসাহায্য করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী যে ধারা বিশ্বাস করতো অষ্টাদশ পুরাণ মানব ভাষায় শুনলে রৌরব নরকবাস হয়, তার বিপ্রতীপে অবস্থানে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' অনুবাদ। যা এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে বাংলা সাহিত্যে।

বাঙালির প্রথম নায়ক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের বঙ্গভূমি আরো অনেক নায়কের সন্ধান পেয়েছে। যাঁরা বাংলা, বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির উন্নতি সাধনে বহু প্রয়াস করেছেন। শক্তিশালী করেছেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। সমাজে সমন্বয়ের মিশ্র সংস্কৃতির ধারাকে পুষ্ট করেছেন। সমাজ বিকাশের কাজে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। সহায়ক হয়েছেন জাতি বিকাশের ধারা বিকাশে। এঁরাও বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার নায়ক। এদের মধ্যে আছেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৭-১৫১৯ খ্রি), শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি), সিরাজউদ্দৌলা (১৭৩৩-২ জুলাই ১৭৫৭), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি) রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), লালন (১৭২২-১৮৯১), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৯৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৬৯-১৯২৫), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-?), শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩- ১৯৬৩), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)।

প্রথম নায়ক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং এ পর্যন্ত শেষ নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরো অনেকের কথা অনেকে তুলতে পারেন, কিন্তু তাঁরা দু-পারের বাঙালিদের সামগ্রিক প্রতিনিধি হতে পারেন কি?

হোসেন শাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৭ খ্রি- ১৫১৯ খ্রি) হাবশিদের বাংলা থেকে দূর করে দেশে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে দেশের আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধনে তৎপর হন। তিনি বহু 'হিন্দু'কে উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তাঁর দরবারের অনেকেই ছিলেন কবি রূপ গোস্বামী-সনাতন খান, কবিরঞ্জন এগুলি ছিল হোসেন শাহের দেওয়া উপাধি।[৪১] (সূত্র : আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পৃঃ- ১০৩)

হোসেন শাহ যেমন উৎসাহিত করেছেন কবিদের তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণে পরাগল খান ও ছুটি খান 'মহাভারত' অনুবাদে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' অনুবাদ করেন। তিনিই মহাভারতের আদি অনুবাদক।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সমসাময়িক একজন গণনায়ক বাংলার জনমানসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেন তাঁর চিন্তা, চেতনা ও কাজের দ্বারা, তিনি শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি)।

শ্রীচৈতন্যের বাল্যকালের নাম নিমাই। জন্মগ্রহণ করেন নবদ্বীপের মিঞাপুর গ্রামে। মুসলমান প্রধান এলাকায়। পরে সেই এলাকার নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে মায়াপুর। বাল্যকাল থেকেই জাতিভেদ চৈতন্য মানতেন না। পরে শিক্ষিত হয়ে জাতিভেদ, আচার বিচার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। চৈতন্য প্রথম জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে বলেন,

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবে মরে।।

(চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড)

মুসলমানরা যেমন বলেন, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই; চৈতন্যও বললেন, যে বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবের উপাসনা করে, সেই দুর্মতি তৃষিত হইয়া জাহ্নবী তীরে কূপ খনন করে।

তিনি উঁচু বংশ নিচু বংশ এই ধারণার বিরোধিতা করে বলেন, চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। অর্থাৎ হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ অপো শ্রেষ্ঠ। চৈতন্য ১৩টির বেশি ভাষা জানতেন, জানতেন সংস্কৃত ছাড়াও আরবি ফার্সি ভাষা। ওড়িয়া, তামিল, হিন্দি, বাংলা সহ ১৩টি ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন তিনি। অসাধারণ গান গাইতেন। মন্ত্রের বদলে গান, মন্দিরের বদলে হৃদয় হল তাঁর মানববিজয়ের মন্ত্র।

চৈতন্যের পর বাঙালি জীবনে যাঁর অবদান ভোলার নয়, তিনি ভারতের শেষ স্বাধীন নবাব এবং বাংলার প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী সিরাজউদ্দৌলা (১৭৩৩, ২ জুলাই ১৭৫৭)। ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সময়ের অনেক আগে জন্মানো এই মানুষ। অতি অল্প বয়সে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে গেছেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি যা বুঝেছিলেন বাঙালি বা অন্য ভারতীয়রা তা বুঝলে ১৯০ বছর ধরে ভারতকে লুঠ করে সম্পদশালী হতে পারতো না ইঙ্গের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। দেশিয় বণিকদের স্বার্থরায় তাঁর সংগ্রাম অবিস্মরণীয়।

চৈতন্যের পর বাংলা ও বাঙালি আলোড়িত হয়েছে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি)'র দ্বারা। যুক্তিবাদ প্রচার তাঁর প্রধান অবদান। 'ইয়ংবেঙ্গলে'র যুক্তিবাদী সংস্কার ভাঙা, প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ আন্দোলন বাংলার শিক্ষা ও সমাজ আন্দোলনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে।

রামমোহন রায়কে বলা হয় (১৭৭২-১৮৩৩), ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রথম বাংলা গদ্য লেখেন তিনি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে লিখে বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হন। পড়াশোনা করেন পাটনার মাদ্রাসায়। আরবি-ফার্সি-সংস্কৃত-হিন্দি-বাংলা-ইংরাজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। এক ঈশ্বরের ধারণা এনে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী পুরুষ। যদিও বিলেত যাত্রায় তিনি প্রথম ব্যক্তি নন, কিন্তু ভারতে ইউরোপীয় ধারায় শিক্ষাপ্রসারের জন্য আন্দোলন করেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। বাংলা ও বাঙালির নমস্য নায়ক তিনি।

আরেকজন মানুষ যাঁর নাম শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিরর-সার প্রায় সব বাঙালি জানে তাঁর নাম লালন (১৭৭২-১৮৯০)। বাউল গানের সাধক সংগ্রামী এই মানুষ জাতিভেদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আজীবন সরব থেকেছেন তাঁর গান ও জীবন নিয়ে। সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে। জাতের কী রূপ কেউ কি জানে? জানে না। যতদিন জাতিভেদ, বর্ণভেদ, শ্রেণিভেদ থাকবে ততদিন লালনের গান শক্তি জোগাবে সংগ্রামী মননশীল মানুষকে। সাধারণ মানুষের কাছে লালনের জীবন দর্শন পৌঁছানো জরুরি ধর্মান্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) আগে এবং পরে বহু মানুষ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছেন, কিন্তু বাঙালি জনমানস 'বিদ্যাসাগর' বলতে একজনকেই বোঝে, যাঁর পোশাকি নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়)। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, সাতপুরুষ মাটি তুলে নতুন মানুষের চাষ করতে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করে বাঙালি

রক্ষণশীল সমাজের বিরাগভাজন হয়েছেন, জীবনের শেষ ২৫ বছরের বেশিরভাগ সময় কার্মাটারে সাঁওতালদের মধ্যে কাটিয়েছেন ভদ্রলোকদের দ্বারা প্রতারিত, নিগৃহীত এবং বিব্রত বোধ করে। নিজের ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বাঙালি শিশুর শিক্ষা শুরু হয় আজো তাঁর লেখা 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫) দিয়ে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। মধুসূদনসহ বহু মানুষের বিপদে ত্রাতা হয়েছেন। তিনি বাঙালি সমাজের আরেক নায়ক।

আর যাঁকে ছাড়া বাংলা ভাষা সংস্কৃতি আজ কল্পনা করাই যায় না, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বাঙালির শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-শিল্প-সংস্কৃতির সকল কিছুতে তাঁর ছোঁয়া। মেয়েরা সাইকেল চালাতে শিখেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে। বাইজি ছাড়াও ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা গান শেখে নাচ করে নাটক করে ছবি আঁকে, সব কিছুর হাতেখড়ি রবীন্দ্র ঘরানায়। মেয়েদের মাটির সাজ, ফুলের সাজ, বড় বড় টিপ, বাটিকের পোশাক রবীন্দ্র-কল্পনা। বাঙালি শিক্ষিত যুবকের কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন ও সমবায় প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্র প্রভাবময়। কবিতা, গান, নাচ, নৃত্যনাট্য এমনকী চিত্রশিল্পেও বাঙালিকে আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় পৌঁছে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও তাঁর শিক্ষাদর্শ থেকে আমরা বহু যোজন সরে যাচ্ছি, তবু তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা।

বাঙালির আরেক নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-?)। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধন এবং সশস্ত্র পথে ভারতের মুক্তি ছিল তাঁর স্বপ্ন। আজাদহিন্দ বাহিনি নিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠায় তাঁর আহ্বান ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬) সম্পর্কে উইকিপিডিয়ার উদ্ধৃতিটি অতি প্রাসঙ্গিক। 'বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় অগ্রণী বাঙালি কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রগতিশীল প্রণোদনার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালি মণীষার এক তুঙ্গীয় নিদর্শন নজরুল। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্যিক, দেশপ্রেমী এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ– দুই বাংলাতেই তাঁর কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত।'

রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। তিনি ইউরোপীয় ভাবধারা থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তদ্ভব, অন্ত্যজ শব্দের কুশলী ব্যবহার বাংলা কবিতাকে দিয়েছে নতুন শক্তি। তিনি প্রথম কবি যিনি কবিতা লিখে জেলে গিয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রধান সাধক। আজ যে বাঙালি মুসলিম বাংলায় নাম রাখে তিনিই তাঁর প্রথম প্রকাশ্য পথ-প্রদর্শক। কাজী সব্যসাচী, কাজী অরিন্দম, কৃষ্ণ মহম্মদ পুত্রদের নামকরণে আরবি-ফার্সির সঙ্গে সংস্কৃত বাংলা, হিন্দু নামধারার সঙ্গে মুসলিম পদবি তাঁর অনন্য কীর্তি। অবিভক্ত বাংলার অবিংসবাদিত নেতা 'শেরে বাংলা' আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬৩) বাংলায় কৃষকদের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। চেয়েছিলেন গরিব হিন্দু মুসলিমদের শিক্ষার সুযোগ দিতে, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপে কৃষক ও প্রজাপ্রেমী সরকার পরিচলনা করতে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী অসমসাহসী ছাত্র বাংলা ও বাঙালির নায়ক হয়ে উঠেছিলেন নিজগুণে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতা

সত্ত্বেও। তিনি সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাসিমরা অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পূরণ হলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের হিন্দির দাপটে পিষে মরতে হতো না।

নেতাজির মতোই সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলনকে 'বাংলাভাষার রাষ্ট্র চাই' লড়াইয়ে পরিণত করার প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার যে সম্মান তাঁর পিছনে প্রধান অবদান দুজনের একজন সাহিত্য সংস্কৃতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আর রাজনৈতিক দিক থেকে শেখ মুজিবুর রহমান। আন্তর্জাতিক সংস্থা যে তাঁকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঘোষণা করেছে তার পিছনে আছে তাঁর কাজ, চিন্তা ও মতাদর্শের স্বীকৃতি। জয় বাংলা, জয় বাংলাদেশ আওয়াজে মথিত হয়েছে সারা বিশ্বের বাঙালি চিত্ত। তাঁর ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারির ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।' ঔপনিবেশিকতাবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের জীবন বাজি রেখে লড়াই করে স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে স্বপ্ন বুনে দিয়েছেন তিনি। জাতির প্রথম নায়ক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ যে বীজ বুনেছিলেন ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তা এক অন্যতর সার্থক পরিণতি পায় জাতির শেষ নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়।

শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া বাঙালি জাতি ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাস লেখা অসম্ভব। বাঙালি পেয়েছে তাঁর নিজস্ব জয়পতাকা। পেয়েছে রাষ্ট্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক দরবারে মাতৃভাষায় কথা বলবার অধিকার। শুধু ভাষার জন্য একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক পরিমণ্ডলেও এক নতুন নির্মাণ। মুসলিম লীগের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দিয়েছে আমাদের।

তাঁর অননুকরণীয় বাগ্মিতা আর মেশবার ক্ষমতা ভয়হীনচিত্ততাও শেখার বিষয় আজকের প্রজন্মের।
তিনিই এখনো পর্যন্ত বিশ্ব বাঙালির শেষ নায়ক।।

তথ্যপঞ্জি

১. সেন, সুকুমার-বঙ্গভূমিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৭
২. তদেব
৩. মুগালি, আর এস- কন্নড় সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্য আকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ- বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৪০৪
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস- বাঙ্গালার ইতিহাস, দে'জ, কলকাতা,
৬. রায়, নীহাররঞ্জন বাঙ্গালীর ইতিহাস, (আদি পর্ব), দে'জ, কলকাতা-১৪০২, পৃষ্ঠা-১০৯
৭. তদেব
৮. ইসলাম, কাবেদুল প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতি গোষ্ঠী, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৩
৯. চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র, বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭২, পৃষ্ঠা-৫
১০. ইসলাম, কাবেদুল বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৯
১১. রায়, নীহাররঞ্জন বাঙ্গালীর ইতিহাস, (আদি পর্ব) দে'জ, কলকাতা-১৪০২, পৃষ্ঠা-১০৯
১২. ঘোষ, প্রভাত কুমার- গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি, জে এস প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৬২
১৩. তদেব

১৪. কোকা আন্তনোভা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৬ পৃষ্ঠা-৮৩
১৫. ইসলাম, কাবেদুল প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতি গোষ্ঠী, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৯
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯
১৭. বাল্মীকি-রামায়ণ, আদিকাণ্ড, একাদশ সর্গ, আর্যশাস্ত্র প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা-৩৪
১৮. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-১
১৯. বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, (১ম ভাগ), বন্দ্যোপাধ্যায় পরেশচন্দ্র, (সম্পাঃ কমল চৌধুরী), দে'জ, কলকাতা, ২০০৬
২০. সেন, দীনেশচন্দ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১ম খণ্ড, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-১
২১. শর্মা, রামশরণ, ভারতের প্রাচীন অতীত, (অনুঃ গৌতম নিয়োগী-সত্যসৌরভ জানা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা-১১
২২. রায়, নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস, (আদি পর্ব), (২য় সং) দেজ, কলকাতা, ১৪০২ পৃ-৩১৭-৩১৮
২৩. শর্মা, রামশরণ, ভারতের প্রাচীন অতীত, (অনুবাদঃ গৌতম নিয়োগী-সত্যসৌরভ জানা), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, কলকাতা ২০১১, পৃষ্ঠা-৫০-৫১
২৪. বসু, তাপস বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪০০ পৃ-৫
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫
২৬. সেন, দীনেশচন্দ্র বৃহৎ বঙ্গ, (২য় খণ্ড), দে'জ, কলকাতা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১০০
২৭. সরকার, দীনেশচন্দ্র পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৩৯
২৮. সুর, অতুল-'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', জিজ্ঞাসা ৩য় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৮৬ পৃষ্ঠা-৩৩
২৯. বাল্মীকি- রামায়ণ, আদি কাণ্ড, সত্তর তম সর্গ, (সম্পাঃ সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ) আর্যশাস্ত্র প্রকাশনী, ১৯৬২, পৃষ্ঠা-১৭৯
৩০. McCrindle, JW- Ancient India as described by by Megasthenes and Arrian, Cambridge Ed. London, 1965, pg.160
৩০ ক. ঘোষ, প্রভাত কুমার- গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি, জে এস প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৪৮
৩১. শর্মা, রামশরণ, ভারতের প্রাচীন অতীত, (অনু: গৌতম নিয়োগী-সত্যসৌরভ জানা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, কলকাতা ২০১১, পৃষ্ঠা-১১
৩২. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ,পৃষ্ঠা-১
৩৩. চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র কৃষ্ণ--বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ-২২৪
৩৪. চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র কৃষ্ণ–বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা- ২২০
৩৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: বাংলা সাহিত্যের কথা [দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১১
৩৬. তদেব, পৃ-১১
৩৭. সরকার, জগদীশ নারায়ণ, Culture of Bengal through the Ages, (A Little Known Aspect of Social History of Medieval Bengal)
৩৮. সরকার, জগদীশ নারায়ণ, Islam in Bengal (Thirteenth to Nineteenth Century), Part One: Political Islam in Bengal Thirteen to Eighteenth Century: A Bird's Eye View, Ratna Prakashan, Calcutta, 1972, page-12
৩৯. সেন, দীনেশচন্দ্র বৃহৎ বঙ্গ, (২য় খণ্ড), দে'জ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১১০০
৪০. তদেব, পৃষ্ঠা
৪১. করিম, আবদুল, বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-১০৩
৪২. খান, শামসুজ্জামান, রাষ্ট্র ধর্ম ও সংস্কৃতি, সময়, ২০১৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৮